সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়: এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

মনোতোষ দাশগুপ্ত

একশো বছরের উপান্তে এসে পিছন ফিরে তাকালে একজন মানুষের ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব, সন্দেহ নেই। কিন্তু সচ্চিদানন্দ বনে ,পাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তা করতে গিয়ে অসুবিধেয় পড়তে হচ্ছে। মানুষটি প্রয়াত হয়েছেন যে মাত্র সেদিন— ২০০৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, বাংলা ৬ফাল্গুন ১৪১০ কিঞ্চিদধিক ৯৩ বছর বয়সে (তাঁর জন্ম বীরভূম জেলার নলহাটিতে ১৯১০-এর ২৩ নভেম্বর, বাংলা ৭ অঘ্রান ১৩১৭)।

তবু তাঁকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলার কারণ ভারতবর্ষে শারীর ও পুষ্টিবিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে তাঁর ভূমিকার কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে ও থাকবে। যে কথাটা একদিন শান্তিস্বরূপ ভাটনগর বলেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্বন্ধে, ঠিক সেই কথাটি আমরা সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও বলতে পারি অনায়াসে। ড. ভাটনগর বলেছিলেন, ‘‘আমরা যে কেউই ভারতবর্ষের যেখানেই রসায়ন-চর্চা করেছি, তারা প্রত্যেকেই হয় পি-সি রায়ের শিষ্য, প্রশিষ্য, বা এক কথায় তাঁর উত্তর-সাধক।’’ বিষয়টা যদি বদলে গিয়ে রসায়নের জায়গায় শারীরবিজ্ঞান হয় তবে স্যর পি-সি রায়ের স্থানে ড. সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বসাতে হবে। অবশ্য যে মশাল সচ্চিদানন্দ জ্বালিয়েছিলেন এবং তাঁর উত্তর-সাধকরা আজও বয়ে চলেছেন, তার প্রথম স্ফুলিঙ্গটি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই। কেমন করে তা-ই বলি।

সেটা ১৯০৩ সাল। এর দু বছর আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক্স প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন ড. কার্তিক বসু। রাজশেখর বসু আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সংস্থার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেল্পমেন্ট বিভাগে নিযুক্ত হলেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। রাজশেখর প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এসসি পড়েছেন ১৮৯৭-৯৯, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার অনার্স; রসায়নে এম্-এ পাস করেছেন ১৯০০ সালে। আচার্যদেব প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন ১৮৮৬ সালে সহকারী অধ্যাপক পদে এবং ছিলেন ১৯১৬ পর্যন্ত। বিদেশে যান ১৯০৪ সালে, ছয় মাসের জন্য। আর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আত্মজীবনী থেকে আমরা জানি আচার্যদেব ক্লাস নিতে ভালোবাসতেন আর নিতেনও। তাহলে প্রমথনাথ বিশী যে কোন সূত্র থেকে বললেন যে রাজশেখর বসু আচার্যদেবের সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন না, তা বোধগম্য হওয়া মুশকিল।

যাই হোক, রাজশেখর বসু তো কেমিস্ট হয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিলেন। তখন সেখানকার বীক্ষণাগারে কাজ হত বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর তৈরি জিনিসগুলির গুণাগুণ বিশ্লেষণ নিয়ে। রাজশেখর এই গবেষণাকে স্বল্প-আধারের ফলিত গবেষণার মধ্যে নিবদ্ধ না রেখে তাকে বিশুদ্ধ গবেষণার সঙ্গে মিশিয়ে দেন। তার সঙ্গে যোগ করেন মানবদেহের উপর

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

তাদের প্রভাব আরও কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়— সে বিষয়টাও। এভাবেই ভারতবর্ষে রসায়ন ও শারীরবিদ্যার সংযোগ ঘটল এবং প্রাণরসায়নচর্চার দরজা খুলল।

এদিকে ১৯০০ সালে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে জীববিদ্যা বা বায়োলজি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৪-এ এই বিভাগ তিনটি বিভাগে বিভক্ত হয়— উদ্ভিদবিদ্যা (বটানি), প্রাণীবিদ্যা (জুলজি) এবং শারীরবিদ্যা (ফিজিওলজি)। ১৯১১ সালে স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন শুরু হয় শারীরবিদ্যা বিভাগে। এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠন শুরু হয় ১৯১৭ -তে। প্রথম প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজেই এই ক্লাস হত, ১৯৩৮-এ বিভাগটি পাকাপাকিভাবে রাজাবাজারের বিজ্ঞান কলেজে উঠে যায়। ড. সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরবিদ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি-এস্‌সি (১৯৪৫ সালে)। প্রথম দিকে গবেষণা করেছিলেন ফলিত রসায়নের তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান ড. বীরেশচন্দ্র গুহর তত্ত্বাবধানে ও পরে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে। তার পর ১৯৪৮-এ ড. ব্যানার্জি প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগ দেন। শুরু হয় শারীরবিজ্ঞানের গবেষণা। সত্যি বলতে কী ওই ১৯৪৮-এই এ দেশে শারীরবিজ্ঞানের গবেষণা প্রাণ পেল। ১৯৫৯ পর্যন্ত এগারো বছর তিনি এখানে কাজ করেছেন, আর ওই সময়ের মধ্যে তাঁর কাছে গবেষণা করে উনত্রিশজন ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন। তারপর সেই ধারা বহমান রেখেছেন, ড. অচিন্ত্যকুমার মুখার্জি (তিনিও ড. ব্যনার্জির ছাত্র এবং তাঁরই কাছে ডক্টরেট) এবং তাঁর সতীর্থ, সহকর্মী ও উত্তর-সাধকরা। তাই বলছিলাম সচ্চিদানন্দ ভারতবর্ষের সারস্বত সাধনার ইতিহাসের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

গবেষণা ও সচ্চিদানন্দ যেন সমার্থক। অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নিয়েও তিনি দেজ মেডিক্যাল-এর গবেষণা সংস্থায় যোগ দেন। সেখানে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। এমনকী যখন তাঁর গবেষণাগার ছিল না, তখনও তিনি সমীক্ষামূলক গবেষণা চালিয়েছেন। ১৯৩৮-এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ সমিতির পুষ্টি (নিউট্রিশন) আধিকারিক পদে ছিলেন। তখন তিনি কলকাতার তেরোটি ছাত্রাবাসের বছরের বিভিন্ন সময়ে রান্না করা খাবারের বিস্তারিত পুষ্টিমূল্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। এটি গবেষণাপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়।

না, আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। গোড়ার কথাটাই বলা হয়নি। সচ্চিদানন্দের বাল্য ও কৈশোর-জীবন? জন্ম তো জেনেছি বীরভূমের নলহাটিতে। বাবা সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি কাজ করতেন প্রাদেশিক জমি-লেখ্য বিভাগে। বদলির চাকরি, তাই তখন নলহাটিতে কর্মরত ছিলেন। মা-র নাম জলধিকুমারী। যদিও শিক্ষারম্ভ হয় অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহি কলেজিয়েট স্কুলে, কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন নলহাটির কাছে দাঁইহাট স্কুল থেকে ১৯২৭-এ। এর পর কলকাতায় এলেন, ভরতি হলেন আই-এসসি ক্লাসে সিটি কলেজে। ১৯২৯-এ ডাক্তারি পড়ার জন্য কারমাইকেল কলেজে ভরতি হন। এই কলেজ বর্তমানে ড. রাধাগোবিন্দ করের নামাঙ্কিত হয়েছে। এখান থেকেই তিনি এম্‌-বি ডিগ্রি নিয়ে বের হন; শল্যচিকিৎসা বিষয় অর্থাৎ সার্জারিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন।

শারীরবিদ্যা তাঁর প্রিয় বিষয়। ডাক্তারি পাঠ্যসূচিতে যেটুকু পড়েছেন, তাতে তৃপ্তি আসছিল না। আরও জানতে হবে— আরও আরও। সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কাছে। তিনি সাম্মানিক শারীরবিদ্যা পড়বেন। পড়লেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯৩৩-এ প্রথম স্থান অধিকার করে পাসও করলেন।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

তার পর স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পাস করলেন ১৯৩৭-এ, সমান কৃতিত্ব দেখিয়ে। কলেজে যেসব শিক্ষকের কাছে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছিলেন বিভাগীয় প্রধান শ্রীনরেন্দ্রমোহন বসু। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শারীরবিদ্যা এ দেশে বিজ্ঞানের একটা মৌলিক শাখারূপে স্বীকৃত হয়েছিল। আর ছিলেন ড. সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি অবশ্য ১৯২৭-এ কলেজের চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন, কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তখনও। ১৯৩৪ যখন অধ্যাপক বসুর উদ্যমে ফিজিয়োলজিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়, অধ্যাপক মহলানবিশ হন তার সভাপতি। কারমাইকেলে পড়ার সময় তিনি সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষক ছিলেন। বলতে গেলে তাঁর পড়ানো থেকেই ছাত্রের শারীরবিদ্যায় কৌতূহল। গুরুদক্ষিণা হিসাবে পরবর্তীকালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে 'অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ স্মারক পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। প্রতি বছর শারীরবিদ্যার সাম্মানিক পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সর্বোচ্চ কৃতিত্বের অধিকারী ছাত্রকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এখানে একটা দুঃখের কথা বলে রাখা দরকার যে অধ্যাপক বসুই আবার পরে একসময় অন্যায়ভাবে সচ্চিদানন্দের গবেষণার সমালোচনা করেন।

যা হোক সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবার কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি কলকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় নিরত হলেন। আগে অবশ্য বাবা চেয়েছিলেন যে তিনি দেশে গিয়ে ডাক্তারি করেন। তখন তা করতে পারেননি বটে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সপ্তাহে দুদিন দেশে গিয়ে বিনা পয়সায় বা খুবই অল্প পয়সায় মানুষের চিকিৎসাও করে গেছেন। সকাল সন্ধ্যায় ডাক্তারি করতেন। ভালোই পসার হল। মাসে পাঁচশো টাকা তখন তাঁর আয় ছিল। দুপুরের অবসরটা তিনি লাগাতে চাইলেন সারস্বত সাধনায়। গেলেন ড. বীরেশচন্দ্র গুহর কাছে। অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক ছিলেন এই ড. গুহ। এতটাই যে বলা হয় তিনিই হয়তো ভিটামিন-সি (অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড, একটি হেক্সইউরোনিক অ্যাসিড) আবিষ্কারকের মর্যাদা ও নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন। অবস্থার প্রতিকূলতা ও ভাগ্যের পরিহাসে এই সম্মান পেলেন হাঙ্গেরির অ্যালবার্ট জেন্টে গায়র্গি (Albert Szent Gyorgy) ১৯৩৭-এ। একটুর জন্য তিনি ভিটামিন বি্ (রাইবোফ্লভিন)-ও আবিষ্কার করতে পারেননি। এর কৃতিত্ব পেয়েছিলেন এ-এল ডে গেম। এই অলোক সামান্য বিজ্ঞানী ও শিক্ষক সচ্চিদানন্দের পরবর্তী শিক্ষক জীবন বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিলেন।

ড. গুহ সাদরে গ্রহণ করলেন সচ্চিদানন্দকে। ড. গুহ আসলে রসায়নের ছাত্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জে-সি ড্রামন্ড-এর অধীনে প্রাণরসায়নে গবেষণা করে পি.এইচ্-ডি উপাধি পান। কিন্তু শারীরবিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ততটা গভীর নয়। সচ্চিদানন্দ ডাক্তার, তাই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটল। অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড বা ভিটামিন-সি নিয়ে ড. গুহর আগ্রহ তো ছিলই, তা ছাড়া সারা পৃথিবীতেই এই যৌগটি সাড়া ফেলেছিল। নানা দিক থেকেই এই যৌগটির উপর কাজ চলছিল। আবিষ্কারের পর প্রায় দেড় দশক ধরে এই কাজের ধারা অব্যাহত ছিল। ১৯৫০-এ প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগেই এর রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে কাজের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ-ডি (তখনকার ডি-ফিল) ডিগ্রি অর্পিত হয়েছে।

ড. গুহর অধীনে সচ্চিদানন্দ এই ভিটামিন-সি নিয়ে কাজ শুরু করলেন। তাঁর কাজ ছিল প্রাণরাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় ঘটনাসমূহের (phenomena) ক্ষেত্রে ভিটামিন-সি-র ভূমিকা। ইঁদুর ও যক্ষ্মারোগীর রেচন-সংযাত ভিটামিন-সি-র অবশেষ

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

পরীক্ষা করে উপস্থিত অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিডের সংযুতি নির্ণয় করেন তিনি। যক্ষ্মা ও স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে এর ভূমিকা সম্বন্ধেও উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় এসব গবেষণায়।

সে সময় সচ্চিদানন্দ দেখেছিলেন যে ধূমপানের জন্যে উদ্ভূত ফ্রি র‍্যাডিকালের ক্ষতিকারক প্রভাব প্রতিহত করতে ভিটামিন-সি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। মজার কথা এই যে ঠিক এ বিষয়ে গবেষণা করেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র কৌস্তুভ পাণ্ডা গত শতকের শেষ দিকে 'ইয়ং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছিলেন।

সচ্চিদানন্দ ভিটামিন-সি পুষ্টির পরিমাণগত বিশ্লেষণের উপায় নির্ণয় করেন। বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় এসব গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছিল। আর আর যেসব বিষয় তাঁর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তাতে ছিল ভাতের ফ্যানে পুষ্টি, ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে খাদ্যের লৌহ-অবশোষণ, ভিটামিন-এ পুষ্টি নির্ধারণে ভিটামিন-সি-র ভূমিকা ইত্যাদি। এসব কাজের তো কোনও ধারাবাহিকতা ছিল না! আর তা না থাকলে ডিগ্রি পাওয়াও সম্ভব নয়। একটু হতাশই হয়ে পড়লেন তিনি।

১৯৪১ সালে অ্যানাল্‌স অব বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন (Annals of Biochemistry and Experimental Medicine) নামক ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। সচ্চিদানন্দ এর সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন ড.বীরেশচন্দ্র গুহ, ড. ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ড. প্রফুল্লকুমার বোস এবং ড. জ্ঞানচন্দ্র রায়।

এ সময় হঠাৎই একটা বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেন তিনি A Mitrea Research Scholarship in Diabetes কাজ করতে হবে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ। এ সংস্থার ডিরেক্টর তখন ছিলেন এল. ই. নেপিয়ার। এঁর সঙ্গে সচ্চিদানন্দের সম্পর্কটি বড় অদ্ভুত ছিল। একসময় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট-এর সম্পাদক হিসাবে তিনি সচ্চিদানন্দের গবেষণাপত্র অযোগ্য বিবেচনা করে ফেরত দিয়েছিলেন। আর সেই গবেষণাই 'নেচার' পত্রিকায় বের হয়। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ কিন্তু ড. নেপিয়ার সচ্চিদানন্দকে খুবই সুনজরে দেখতে থাকেন। ফলে গবেষণার জিনিস পেতে তাঁর কোনও অসুবিধে হয়নি। এমন কী একসাথে ৬০টি গিনিপিগের জোগানও তিনি পেয়েছিলেন।

গবেষণার শুরুই হল ভিটামিন, সি-র সঙ্গে ডায়াবেটিস্ (বহুমূত্র) রোগের সম্পর্ক ও রোগের প্রতিরোধ নিয়ে। প্রথমেই যে উল্লেখযোগ্য প্রতিপাদন বেরিয়ে এল তা হল—ভিটামিন সি-র অভাব থাকলে দেহে গ্লুকোজ দহনের ক্ষমতা কমে যায়। এ ধরনের ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে তিনি ডায়াবেটিস্ রোগের চিকিৎসায় ভিটামিন-সি ব্যবহারের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ওই যে মধুসূদন লিখেছিলেন: 'মাৎসর্য বিষদশন কামড়ে রে অনুক্ষণ'! কয়েকজন গবেষক সচ্চিদানন্দের বিরুদ্ধে গেলেন। 'নেচার'-এর মতো পত্রিকায় তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে, অথচ তাঁরা বললেন যে এ ফল ভুল; এতে সংস্থার সম্মানহানি ঘটবে। আরও বলা হল তিনি নাকি গিনিপিগের অগ্ন্যাশয় (প্যানক্রিয়াস) বাদ দিতেই জানেন না। অবাক কাণ্ড এই যে, এ অভিযোগ আনা হল যাঁর বিরুদ্ধে তিনি ডাক্তারির শেষ পরীক্ষায় শল্যচিকিৎসাবিদ্যায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন।

যা হোক যথাসময় তিনি এই অপবাদ থেকে মুক্ত হলেন, শুধু তাই নয় গবেষকসমাজে তাঁর সুনাম অনেক বেড়ে গেল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে গেলেন একটা বিশেষ গবেষণার জন্য। ওখানকার রসায়নের অধ্যাপক

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

ড. মাধবচন্দ্র নাথ ডায়াবেটিস্-এর একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন। সচ্চিদানন্দকে ওষুধটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হয়েছিল।

যেদিন তিনি ঢাকায় পৌঁছুলেন, একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। সচ্চিদানন্দ আজীবন খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি ও গান্ধীটুপি পরতেন। জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়েও তিনি নিজের হাতে ওই পোশাক কাচতেন, কলপ দিতেন, ইস্ত্রি করতেন। তা, ওই পোশাকেই তো তিনি ঢাকা গেলেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য কোনও প্রতিনিধি সেখানে নেই। কী আর করা! তিনি তাঁর বন্ধু নরেশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি গেলেন। বিকেলে জানতে পারলেন যে প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি তো কোট-প্যান্ট পরা কোনও সাহেবকে আশা করেছিলেন! তাই ফিরে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে ডাক্তার সাহেব আসেননি। এটা ১৯৪২-এর ঘটনা। পুরো এক বছর ও হয়নি, তিনি স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ ঢুকেছিলেন গবেষণার জন্যে। মাত্র দশ মাসের মধ্যে তাঁর থিসিসের কাজ শেষ। থিসিস্ জমা দিলেন ১৯৪৩-এর ২৩ জানুয়ারি দশ মাসের মাথায়।

এঃ, আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। বলতেই ভুলে গেছি যে ১৯৩৫-এ তিনি একটা মিষ্টি কাজ সমাধা করে ফেলেছেন। বিয়ে করেছেন পার্বতীকে। জন্মের পর একেই দেখতে গিয়েছিলেন মা-র সঙ্গে। আর তখনই দুই মা মিলে এই বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলেন। বয়সের তফাত দুজনের প্রায় পনেরো বছর। ১৯৪৪-এ পার্বতীর যখন উনিশ বছর বয়স, তখনই দুই ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি মা হওয়ায় পার্বতীকে নিয়ে একটু বিব্রতও হতে হয়েছে সচ্চিদানন্দ কে। যেমন একবার ছেলে অশোকের ভীষণ জ্বর—প্রায় ১০৬°। বাড়ি থেকে বলা হল তক্ষুনি বাড়ি ফিরে আসতে। কিন্তু গবেষণায় ব্যস্ত স্বামী বাড়ি ফিরতে পারেননি। টেলিফোনেই নির্দেশ দিয়ে বাড়ি ফেরেন একেবারে রাত্রে। আর সেদিন পার্বতীর কী অভিমান! কান্নাকাটি। এমন একটা হৃদয়হীন মানুষের ঘর করতে হচ্ছে তাঁকে।

এসব অবশ্যই সাময়িক! এঁদের দাম্পত্য-প্রেম পূর্ণ দীপ্তি ও সুরভি নিয়ে বিদ্যমান ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সচ্চিদানন্দের প্রয়াণের সামান্য কয়েক বছর আগেই প্রয়াত হন পার্বতী। অত তাড়াতাড়ি সন্তান হওয়ায় পার্বতীও তাঁর দীর্ঘজীবী স্বামীর সঙ্গে নাতির মেয়ে পুতনিকেও দেখে গেছেন, মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত তার অন্নপ্রাশনে আনন্দ করে গেছেন।

১৯৪৪-এর অক্টোবরের শেষে সচ্চিদানন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসবিহারী ঘোষ ভ্রমণ বৃত্তি নিয়ে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কাজ করেন তিনি নিউইয়র্কের কর্নেল ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল কলেজে। পরে কিছুদিন ম্যাডিসনে উইস্কনসিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব এগ্রিকালচারের প্রাণরসায়ন বিভাগের প্রধান ড. এলভেজেম্ (Elvehjem)-এর সঙ্গেও কাজ করেছিলেন। কর্নেলে তিনি অধ্যাপক দুভিনিউ (duVigneud)-র বীক্ষণাগারে গবেষণা করেছিলেন। আমেরিকায় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল গিনিপিগ দেহে transmetylation, রক্তে-এর পরিমাপন এবং গ্লুকোঅ্যাসকরবিক অ্যাসিড বিষয়ে। তিনি আমেরিকা থাকতেই ক্লোরামফেনিকল আবিষ্কৃত হয়। তিনি পরে দেশে ফিরে দীর্ঘদিন এই ক্লোরামফেনিকল নিয়ে গবেষণা করেন।

গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বৈচিত্র্যানুসন্ধানী। কতই বিচিত্র বিষয়ে যে তিনি গবেষণা করেছেন! নজরে কিছু পড়লে হল। বলেছেন তিনি তাই তাঁর আত্মজীবনীর ভূমিকায় "গবেষণা করার জন্যে সদিচ্ছাই বড়ো কথা। খুব বেশি বুদ্ধি প্রয়োজন

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

হয় না। কাজ করতে করতেই গবেষণার বিভিন্ন দিক দিয়ে অনেক পরিকল্পনার কথা মনে আসে। কাজ করে যেতে হবে।"

তিনিও করেছিলেন। শেষ গবেষণাপত্র তাঁর বের হয় ১৯৯১-এ, বয়স তাঁর তখন ৮১ বছর। একক বিষয় ধরলে সব চেয়ে বেশি কাজ তিনি করেছেন অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড (ascorbic acid, ভিটামিন সি) নিয়ে। প্রায় পঞ্চান্নটি গবেষণাপত্র তিনি এর উপরে প্রকাশ করেছিলেন। তার পর আছে ক্লোরামফেনিকল, নিকোটিনিক অ্যাসিড, ডায়াবেটিস্ ইত্যাদি। একটা বিষয় ধরলে তিনি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ না করে ক্ষান্ত হতেন না। গবেষকমহলে তাঁর খ্যাতিই ছিল 'মাস্টার অব ভিটামিন-সি' বলে। আর তিনি সারা বিশ্বেই একজন ডায়াবেটিক বিশেষজ্ঞ হিসাবেও পরিচিত ছিলেন।

অবস্থা-বিপাকে যখন তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের চাকরি থেকে বিতাড়িত হয়ে রাজস্থানের বিকানীর মেডিক্যাল কলেজে শারীরবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন তখন রাস্তায় উট দেখতে পেয়ে উটের কুঁজের বিপাকীয় স্তরের উপর গবেষণা করতে মনস্থ করেন। এগারোটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন তিনি উটের উপর। উট যে দারুণ গরমে ১৭ দিন জল না পেলেও বেঁচে থাকতে পারে, এ ঘটনার পিছনে যে শারীরবৃত্তীয় কারণ আছে, তা সচ্চিদানন্দই প্রথম গবেষণায় বের করেন। বিশ্ববন্দিত তাঁর এই কাজ।

আমেরিকায় থাকতে তিনি বিখ্যাত ডাক্তার বিজ্ঞানী ওয়াই-বি সুব্বারাওয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। সুব্বারাও ফলিক অ্যাসিডের আবিষ্কর্তা। এশিয়াটিক ফিভার-এর ওষুধ এই ফলিক অ্যাসিড। দেশে ফিরে তিনি এই ফলিক অ্যাসিডের উপরও কাজ করেন। ১৯৩৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ সমিতির নিউট্রিশন আধিকারিক থাকার সময় তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের খাদ্যের পুষ্টির সমীক্ষা বিষয়ক দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। রাজস্থানে গিয়ে রাজস্থানি ছাত্রদের পুষ্টির সমীক্ষা বিষয়ক ১৩টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর গবেষণা, তাই দেখি, শুধু সারস্বত (academic) সাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, লোকায়ত (popular) ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল। আমরা জানি যে খেসারি ডাল সহজেই জন্মায় এবং এর ফলন খুব বেশি। গরিব মানুষের ক্ষেত্রে এই ফসলটি খুব কাজের বস্তু। কিন্তু সাধারণ্যে প্রচার হয়ে গেছে যে খেসারি ডাল খেলে ঝিনঝিনি রোগ হয়। তাই এর বাজার মূল্য প্রায় শূন্য। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষণায় দেখিয়েছেন যে এই ধারণা সর্বৈব ভুল। তেমনি ভোজ্য তেলের ব্যাপারটাও। সরষের তেলের পরিবর্তে অন্য অনেক তেলের কথা বহুল প্রচারিত। মজা হচ্ছে কোলেস্টেরল কমাবার দাবিদার অনেক তেলেই আয়োডিন মানক সরষের তেলের থেকে বেশি। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে ভোজ্য তেল হিসাবে বিশুদ্ধ সরষের তেল অন্য অনেক তেলের থেকেই ভালো।

প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকতে কাঁচকলার খাদ্যগুণ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় বা হত যে কাঁচকলায় আয়রন আছে। এজন্যই পেট খারাপ হলে কাঁচকলা পথ্য দেওয়া হত। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় দেখলেন যে না, কাঁচকলায় আয়রন নেই। কিন্তু তা যথেষ্ট পরিমাণে অন্যান্য খাদ্যগুণসমৃদ্ধ। একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরবিদ্যা ভিভাগের পুনর্মিলন উৎসবে পশ্চিমবাংলার খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এসেছিলেন। খাদ্য সমস্যা জর্জরিত রাজ্যের অবস্থা নিয়ে ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। শ্রীসেন বিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষক। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিজ্ঞানীরা কলেজ-

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

বিশ্ববিদ্যালয়ে বীক্ষণাগারে গভীর গবেষণার সঙ্গে জনকল্যাণমূলক গবেষণা করুন। কথা প্রসঙ্গে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁচকলার উপর তাঁর পর্যবেক্ষণের কথা জানালেন শ্রীসেন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়কেও উৎসাহিত করলেন।

তার পর সে তো পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক মস্ত ভুল-বোঝাবুঝির ইতিহাস। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণার উপর ভিত্তি করেই তিনি বাঙালিকে কাঁচকলা খাওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সংবাদমাধ্যম ও বিরোধী রাজনীতিকরা শ্রীসেন কে ভুল বোঝেন। ভোটে কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হয়। রাজনীতির ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।

ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা-জীবন মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় প্রারম্ভ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে অবস্থানকাল (অর্থাৎ ১৯৪৮-১৯৫৯) পর্যন্ত। বিদেশ থেকে ফিরে অতি অল্প সময় স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ রসায়নের অধ্যাপক পদে কাজ করার পরে ১৯৪৮ -এর ৮ সেপ্টেম্বর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে শারীরবৃত্তের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ছিলেন এগারো বছর। আজ জেনেছি যে এই সময়ে ২৯ জন ছাত্র তাঁর কাছে গবেষণা করে ডক্টরেট পায়। গবেষণার বিষয় ছিল: জল ও অঙ্কুরিত ডালের পুষ্টি, খাদ্যে ক্যালোরির হিসাব ও গণনা।, ভিটামিন-সি ও শর্করা-র বিপাক, ভিটামিন-সি ও কোলেস্টের বিপাক, রোগ ও সুস্থতায় ভিটামিন-সি, গ্লুটাথায়োন ও ডিহাইড্রোঅ্যাস্করবিক অ্যাসিডের ভূমিকা, ভিটামিন-সি ও প্রোটিন বিপাক, ভিটামিন-সি-র সঙ্গে হর্মোন-রক্তাল্পতা-রক্তচাপের সম্পর্ক, নিকোটিনিক অ্যাসিড—ট্রিপ্টোফেন সম্পর্ক, প্যান্টেথেনিক অ্যাসিড-ফলিক অ্যাসিড-ভিটামিন বি্ডায়োটিন বিপাক, কলেরা-টাইফয়েড মনোরোগ-এর ক্ষেত্রে প্রাণরাসায়নিক পরিবর্তন ইত্যাদি।

এই সময়টাই ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের স্বর্ণযুগ। ছাত্রছাত্রীরা ও গবেষণা-সহায়ক-সহায়িকারা তাঁর অতি কাছে আসতে পারত। বিভাগের প্রাচীর পত্রিকা, বিভাগের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির প্রবর্তন করলেন তিনি। বিভাগীয় পুনর্মিলন অনুষ্ঠান শুরু হল। এই উপলক্ষে নাটক, পত্রিকা প্রকাশন, খাওয়াদাওয়া নিয়ে এলাহি আনন্দযজ্ঞ চলত। তাঁর উদ্যোগেই স্বল্প দূরত্বের বিভাগীয় ভ্রমণ ভারতবর্ষের দূর দূর অঞ্চলে (যেমন, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, বিশাখাপত্তনম, রাজস্থান, দিল্লি, গৌহাটি, কন্যাকুমারী, বোম্বাই প্রভৃতি) প্রসারিত হয়।

ভাগ্যদেবী রসিকতাও জানেন, আর রসিকতা এক এক সময় বেশ ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। তা-ই হয়েছিল ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও। সরকারি কলেজে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান খরচের একটা নিয়ম আছে। এটা খরচ করা যায় কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে, আর এগুলো হচ্ছে—(১) যাতায়াত (ট্রেন ছাড়া, কারণ সেক্ষেত্রে একক-ভাড়া-দ্বিগুণ-যাত্রা), (২) থাকা (৩) আনুষঙ্গিক আর (৪) ভর্তুকি। শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটু এদিক-ওদিক করতেই হয়। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ও করেছিলেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার জন্য বা অকপট সারল্যের জন্য কাগজপত্র ঠিক করেননি। তিনি ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস পরিদর্শনে যান। ছাত্রছাত্রীদের (তাঁর নিজেরও) যাতায়াতের খরচ সরকারি অনুদান থেকে দেওয়ার কথা—যার পরিমাণ পঞ্চাশ টাকা। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় করলেন কী ছাত্র ছাত্রীদের আবদার মতো ওই খরচটা তাদের থেকে নিলেন, আর পঞ্চাশ টাকায় সবাই মিলে কফি হাউসে খাওয়া দাওয়া করা হল। কেউ শত্রুতাবশত ব্যাপারটা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিল। তার ফলে তিনি চাকরি থেকে বিতাড়িত

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

বিতাড়িত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি শিক্ষা দপ্তরে এরকম ঘটনার নিদর্শন আজ পর্যন্ত ওই একটিই। ভাগ্যদেবীর ঝাঁজালো এই রসিকতার জেরে সচ্চিদানন্দকে তাঁর স্বপ্নপ্রিয় কর্মভূমি ছেড়ে এক ধাক্কায় যেতে হল বিকানির মেডিক্যাল কলেজে। আত্মীয়স্বজন ছাড়া তখন সামান্য সহানুভূতিটুকুও কেউ জানায়নি। শুধু এই শিক্ষক ও তাঁর ছাত্ররা পরস্পরের চোখের জলে বিচ্ছেদ-মুহূর্তটিকে মর্মস্পর্শী করে রেখেছিল।

বাংলার সচ্চিদানন্দ এখানে ইতিহাস তৈরি করে নতুন ইতিহাস তৈরি করতে গেলেন রাজস্থানের বিকানির মেডিক্যাল কলেজের শারীরবৃত্তের অধ্যাপক পদে— সেটা ১৯৫৯ সাল। এখানেই সম্পন্ন হয় তাঁর গবেষণাজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। ১৯৬৫ পর্যন্ত স্থায়ী এই পর্যায়ে তাঁর কাছে গবেষণা করে ডক্টরেট পায় বারোজন ছাত্র। প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা ৬৬। গবেষণার ক্ষেত্র: উটের শারীরবৃত্তীয় সমীক্ষা, বিভিন্ন ভোজ্য তেল খাওয়ানোর পরে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন, লিঙ্গভেদে ছাত্রদের দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালোরির পরিমাণ, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের খাদ্যের পুষ্টি ও জীবনীশক্তি, ভিটামিন-সি, পাকস্থলীর ক্ষরণ ও হরমোন এবং অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগে শরীরের বিপাকীয় পরিবর্তন। এখানে তিনি আবার রাজনীতির আবর্তে পড়ে যান ফলে শেষ বছরটা জয়পুরের মেডিক্যাল কলেজে যেতে হয়। রাজনীতিকদের অসহযোগিতা ও স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে আপস করতে না পেরে পদত্যাগ করে কলকাতা ফেরেন ১৯৬৫-র ২৯ জুন।

এবার তৃতীয় পর্যায়। দেজ মেডিক্যালের কর্ণধার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে-র আহ্বানে তিনি যোগ দিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের বীক্ষণাগারে। এখানে ছিলেন বারো বছর। এখানে সাতজন তাঁর কাছে গবেষণা করে ডক্টরেট পান; প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা ৩২টি। গবেষণার ক্ষেত্রে ক্লোরামফেনিকল, নাইট্রোফুরান্টন, পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, ভিটামিন-সি, পেন্টাএরি থ্রিটল টেট্রাসাইট্রেট (পেট,PET) সাস্টেনড রিলিজ প্রিপারেশন। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় দেজ মেডিক্যালে যোগ দেবার পর পার্ক ডেভিস-এর সঙ্গে দেজ-রে বিরোধ বাধে। দেজ যে ক্লোরামফেনিকলের পিডিয়াট্রিক সিরাপ বিক্রি করত, পার্ক ডেভিস তার গুণপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বসল। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষণা করে প্রাপ্ত ফল নিয়ে প্রকাশ্য সভায় পার্ক ডেভিস-এর বিরোধিতা নস্যাৎ করেন। এ থেকেই ক্লোরামফেনিকলের উপর তাঁর গবেষণার সূত্রপাত।

দেজ মেডিক্যালে ভালোই ছিলেন তিনি। কিন্তু দুটো ব্যাপারে তাঁকে মাঝে মাঝে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল। প্রথমটি, নিজের উপর অগাধ আস্থা তাঁকে কিছুতেই অন্যের কাছে মাথা নত করতে দেয়নি। তার ফলে খোদ ভূপেন্দ্রনাথ দের-সঙ্গেই মতবিরোধ দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামপন্থার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বাড়তে থাকে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘেরাওয়ের প্রবণতা দেখা দেয়। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার উপর জোর দেওয়ায় তাঁকেও কর্মীদের বিরোধিতায় সম্মুখীন হতে হয়। তবু গবেষণাকে ভালোবেসেছিলেন বলেই প্রায় এক যুগ দেজ মেডিক্যালে কাজ করে অবসর নেন ১৯৭৭-এর ৩০জুন।

গবেষণার নেশা তাঁকে ছাড়েনি না। ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের কাছে অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী হিসাবে গবেষণা বৃত্তির জন্য আবেদন করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মাধ্যমে দরখাস্ত দেন। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে সেই দরখাস্ত পাঠানো হয়নি। বীতশ্রদ্ধ বিজ্ঞানী সারস্বত সাধনার অঙ্গন থেকে স্বেচ্ছাবসৃত হলেন।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

স্বাধীন বৃত্তি—চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করলেন। তাঁর বাবার যে ইচ্ছা ছিল, সেই ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে তিনি প্রতি শনি ও রবিবার নিজের দেশের বাড়ি নলহাটি গিয়ে রোগী দেখতেন। জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত এ অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন তিনি। আজকের নগরমুখী জীবনযাত্রার আকর্ষণের প্রেক্ষিতে এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে কলকাতার নামি চিকিৎসকরা মফস্‌সল সপ্তাহে এক আধবেলা রোগী দেখেন কিন্তু সেটা অর্থপ্রাপ্তির জন্যে। আর এই 'বুড়ো ডাক্তার' (গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় এ নামেই ডাকত তাঁকে) গ্রামে গিয়ে সপ্তাহে দুশোরও বেশি রোগী দেখতেন মানুষ ও 'দেশ' কে ভালোবেসে। প্রাপ্তিও ছিল নেহাতই নগণ্য। একবার তো অন্ধকারে ফেরার সময় স্টেশনে এক দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে আহত হন। দু-মাস শয্যাশায়ী থাকতে হয়। তার পরেও 'দেশে' গেছেন।

এ সময়ে হঠাৎই তীব্র মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে পড়েন তিনি। এ এক মনস্তাত্ত্বিক প্রহেলিকাই বলতে হয়। যে মানুষটা এত সব বিরুদ্ধতাকে সবলে অগ্রাহ্য করে মাথা উঁচু করে জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছেন আটটি দশক, তিনি এমনভাবে ভেঙে পড়বেন, এ তো ভাবাই যায় না! আপাত কোন, কারণও ছিল না। স্ত্রী অবশ্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভরতিও হন। আবার সুস্থ হয়ে তো বাড়িও ফিরে এসেছিলেন! জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। গোটা কুড়ি ঘুমের বড়ি খেয়ে, ব্লেড দিয়ে দুই হাতের কবজির রেডিয়াল আর্টারি কেটে শুয়ে পড়েন। অবাক কাণ্ড এই যে সারারাত এবং পরদিন সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত এভাবে থেকেও তিনি বেঁচে গেলেন। তখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাক্তনী সংসদের সভাপতি। কিন্তু আমরা কেউ এ খবরের আঁচটুকুও পাইনি। আসলে ছেলে অশোক ও জামাই প্রণব (চট্টোপাধ্যায়) ডাক্তার হওয়ায় ব্যাপারটা বাইরের কেউ জানতে পারেননি। জিজ্ঞেস করেছিলাম পরে। বলেছিলেন 'কী জানি! বোঝা গেল আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি', এর পর আত্মজীবনী লেখেন 'ফেলে আসা দিন, তাতে এ ঘটনা গোপন করেননি।

প্রেসিডেন্সিতে পূর্ণ মর্যাদায় তাঁকে আমরা ফিরিয়ে এনেছিলাম, তবে অন্য ভূমিকায়। আমরাও কৃতজ্ঞ যে তিনি অভিমান ভুলে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। সেটা ১৯৮৯ সাল। শারীরবিদ্যা বিভাগের পুনর্মিলন উৎসবে সভাপতি হয়ে এলেন। অবশ্য এর তিন বছর আগে বিভাগীয় প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রদের প্রীতি ক্রিকেট খেলায় এসেছিলেন। আত্মভোলা সারস্বত সাধকের সব অভিমান গলে অশ্রুধারা হয়ে সমাগত সতীর্থদের মন দ্রব করে দিল; তিনি গাইছেন "কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।"

এর পর কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃ দিবসেও তিনি সভাপতি হয়ে এসেছেন; প্রাক্তনী সংসদের কার্যকর সমিতির সদস্য হয়েছেন; চারটি বছর (১৯৯৫-১৯৯৯) সংসদের সভাপতি থেকেছেন। যে বিকানির মেডিক্যাল কলেজ এক সময় তাঁর প্রতি অবিচার করেছিল, তাঁরা যখন পরবর্তীকালে (১৯৯৯ সালে, কলেজের ৪০ বছর পূর্তি উৎসবে) তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়, তিনি সব অভিমান ঝেড়ে ফেলে সেখানে হাজির হয়েছিলেন।

লোকে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছে, কিন্তু তিনি কার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেননি। অভিমান হয়তো হয়েছে, কিন্তু সেই অভিমান তাঁকে একটা রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করতেও প্ররোচিত করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে কবির জীবনে অমৃত ও গরল দুইই আসে। কিন্তু কবি গরলটুকুই নিজের জন্য রেখে অমৃত

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

বিলিয়ে যান সবার জন্য। সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঠিক তেমনি।

তিনি কবিতা লিখেছেন। আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে ফেরবার সময় আদরের ও ভালোবাসার পাত্রী স্ত্রী পার্বতীকে উদ্দেশ্য করে প্রথম কবিতা লেখেন। তার পর বিভিন্ন উপলক্ষে। বিজয়াতে কাছের মানুষদের কবিতায় শুভেচ্ছা জানাতেন। বর্তমান লেখকের সঞ্চয়ে এমন কয়েকটি এখন আছে। এমনকী তাঁর মেয়ে ও নাতনিকেও লিখেছেন। হয়তো কবিতাগুলির সাহিত্যমূল্য সে অর্থে বেশি নয়, কিন্তু ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন! জীবনের অমৃতটুকু সকলকে বিলোতে গিয়ে তিনি কবি হয়েছেন। আর এই অর্থে তিনি সার্থক কবি।

নিজের ক্ষেত্রেও দেখেছি শেষ জীবনেও জীবন দেবতার কাছ থেকে পাওয়া অমৃতটুকুই তিনি উপভোগ করেছেন, আঘাতের বিষকে উপেক্ষা করেছেন—ভুলতে চেয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষের ন্যাশন্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি 'ফেলো' হন; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের শারীরবিদ্যা শাখার সভাপতি হন (১৯৫২), আমেরিকান ডায়াবেটিস্ অ্যাসোশিয়েশনের সভ্যপদ পান (১৯৪৬), হিমোগ্লোবিনের তুলনামূলক গঠনাকৃতির উপর গ্রিস-এর থেসালোনিকায় অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে আমন্ত্রণ পান। মহাভারতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন:

"ন হৃষ্যত্যাত্মসম্মানে নাবমানে চ তপ্যতে।

গাঙ্গোহ্রদ ইবাক্ষোভ্যো য চ পণ্ডিত উচ্যতে।।"

[যিনি সম্মান প্রদর্শনে হৃষ্ট বা অপমানে রুষ্ট হন না, (গভীরতা হেতু) মানস সরোবরের মতো যিনি অচঞ্চল তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়।]

ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে পণ্ডিতের এই দুটি লক্ষণই আছে। তাঁর ইংরেজি ও বাংলায় লেখা আত্মজীবনী পড়লে আশ্চর্য হতে হয় দেখে যে কী নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তিনি জীবনের ঘটনাগুলি বলে গেছেন। আর চেয়েছেন আগামী প্রজন্ম যেন তাঁর জীবন থেকে কিছুটা হলেও প্রাণিত হয়। যে কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ এর সেপ্টেম্বরে লিখেছিলেন হুবহু সেই কথাই ধ্বনিত হয়েছে সচ্চিদানন্দের জীবনকাহিনির মধ্যে:

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে/ যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে যারা অন্যমনা, তারা শোনো/ আপনারে ভুলো না কখনো।/ মৃত্যুঞ্জয় যাহা প্রাণ/ সব তুচ্ছতার উর্ধ্বে দীপ হয়ে যারা জ্বলে অনির্বাণ/ তাহাদের মাঝে যে হয়/ তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।/ তাহাদের খর্ব কর যদি/ খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।/তাদের সম্মানে মান নিয়ো/ বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

সচ্চিদানন্দ নিয়েছিলেন। ড. বীরেশচন্দ্র গুহ, ড. সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ ড. জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত, ড. জ্যোতিষচন্দ্র রায়, ড. ইলিয়ট পি. যশলিন, ডা.ওয়াইসুব্বারাও, মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন, স্যর আশুতোষ মুখার্জি প্রমুখ মহান মানুষদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এঁদের কাছে ঋণ স্বীকারে তাঁর এতটুকু **দ্বিধা ছিল** না। নিজের

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

জীবনীটাকে এঁদের সাধনার ছাঁচে ঢেলে সাজাতে চেয়েছেন তিনি। যেখানে পেরেছেন উঁচু গলায় বলেছেন, যেখানে মনে হয়েছে তিনি পারেননি, নতমস্তকে নিজেকেই দায়ী করেছেন।

আর একজনকে তিনি মানতেন অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়। তাঁরই প্রাণের প্রদীপে তিনি তাঁর জীবনে চলার পথকে আলোকিত করে রেখেছিলেন। এই মানুষটির নাম স্বামী নিখিলানন্দ; নিউইয়র্কের শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টারে তাঁর সঙ্গে সচ্চিদানন্দের পরিচয় পরে তাঁর মন্ত্রশিষ্য হন তিনি। আর নিখিলানন্দের মাধ্যমেই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবা ও মানবপ্রেমের আদর্শে প্রাণিত হয়েছিলেন। আর সমর্থন পেয়েছিলেন নিজের সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চতর চিন্তাধারার মেলবন্ধনের প্রয়াসের। হ্যাঁ এই একটা ব্যাপারে তাঁর একটু হলেও গর্ব ছিল।

তাঁকে দেখলেই মনে হত তিনি আনন্দে আছেন। মানুষ নাকি বৃদ্ধ না হলে সুন্দর হয় না। তাঁকে দেখে কথাটির সত্যতা বোঝা যেত। আশির শুভ্র মানুষটিকে দেখেছি তাঁর 'পুতানি' (নাতির মেয়ে)-র অন্নপ্রাশনে দেখেছি, ছাত্রের মেয়ের বিয়েতে—যেন তাঁকে ঘিরে আছে আনন্দের আলোকবলয়। আর এই আনন্দে থাকতেন বলেই এক শান্ত ও শুভ্র সৌন্দর্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন শান্তি ও শান্ততার আলোক সরণি বেয়ে পরম উপলব্ধির সিংহদুয়ারের অভিযাত্রী হতে। বলতে পেরেছিলেন, ''তার অন্ত নাই গো নাই যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।/ তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ,/ ও তার অন্ত নাইগো নাই।'' তাঁর জীবনটাই আলো আর আনন্দের পাঁচালি। এই আলোক-পুরুষকে প্রণাম।

প্রাক্তন ছাত্র ১৯৫৯-১৯৬১ *(রসায়ন)*

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073